সংসার

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূ বেশ সুন্দরী। একটি মাত্র ছোট ছেলে নিয়ে অত বড় পুরনো সেকেলে ভাঙা বাড়ির মধ্যে একাই থাকে। স্বামীর পরিচয়ে বৌটি এ গ্রামে পরিচিতা নয়, অমুকের পুত্রবধূ এই তার একমাত্র পরিচয়। কারণ এই যে স্বামী ভবতারণ ভটচাজ ভবঘুরে লোক। গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে বাপের যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে, এখন কোথায় যেন সামান্য মাইনেতে চাকরি করে, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসে, কোনো শনিবারে আসেই না। শ্বশুর উপেন ভটচাজ গ্রামের জমিদার মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে নিত্যপূজা করেন। সেখানেই থাকেন, সেখানেই খান। বড় একটা বাড়ি আসেন না তিনিও। ভালো খেতে পান বলে ঠাকুরবাড়িতেই পড়ে থাকেন, নইলে সকালের বাল্যভোগের লুচি ও হালুয়া, পায়েস, দই ও বৈকালীর ফলমূল বারোভূতে লুটে খায়।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ি আসেন। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি, তাতে প্রসাদী লুচি ও মিষ্টি, ফলমূল, একটু বা ক্ষীরের ছাঁচ থাকে। তাঁর নাতি করুণার বয়স এই সাত বছর। না খেতে পেয়ে সে সর্বদা খাইখাই করছে, যা হয় পেলেই খুশি, তা কাঁচা আমড়া হোক, পাকা নোনা হোক, চালভাজা হোক, তালের কল হোক, আধপাকা শক্ত বেল হোক। খাওয়া পেলেই হল, স্বাদের অনুভূতি তার নেই। ঝাল, টক, মিষ্টি, তেতো তার কাছে সব সমান।

—ও করুণা, এই দ্যাখ্—কি এনেছি—

—কি ঠাকুরদাদা?

'দাদু-টাদু' বলার নিয়ম নেই এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে, ওসব শৌখিন শহুরে বুলি করুণা শেখেনি। সে ছুটে যায় উৎসুক লোভীর ব্যগ্রতা নিয়ে। ঠাকুরদাদা পুঁটুলি খুলে দুখানা আখের টিকলি, একটা বাতাসা ওর হাতে দেন। ও তাতে মহাখুশি। ঠাকুরদাদা যে জিনিস দেন, তার চেয়ে যে জিনিস দেন না তা অনেক ভালো ও অনেক বেশি। পুঁটুলির সে অংশে থাকে বৈকালী ভোগের লুচি, কচুরি, মালপুয়া ও তালের বড়া। যখনকার যে ফল সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করার প্রথা এ ঠাকুরবাড়িতে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এখন ভাদ্র মাস, কাজেই তালের বড়া রোজ বিকেলে নিবেদিত হয়।

করুণা এক-আধবার পুঁটুলির অন্য অংশে চাইলে।

কিন্তু তাতে তার লোভ হয় না, ও রকম দেখতে খুব ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত। সে জানে ও অংশে তার কোনো অধিকার নেই।

ঠাকুরদাদার দিকে ও বোকার মতো চেয়ে থাকে। উপেন ভটচাজ গলার কাশির আওয়াজ করে পুত্রবধূকে তার আগমনবার্তা ঘোষণা করতে করতে বাড়ি ঢোকেন এবং সটান দোতলায় নিজের ঘরটিতে চলে যান।

রোজ তাঁর ঘরটিতে নিজে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান এবং এসে আবার খোলেন। পুত্রবধূকে বিশ্বাস করার পাত্র নন তিনি। কোনো মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস নেই।

—ও বৌমা—বৌমা, ওপরে এস

—কে? বাবা?

—একবার ওপরে এস।

পুত্রবধূ ওপরে গিয়ে দেখে শ্বশুর পুঁটুলি খুলে কি সব খাবার জিনিস ত্রস্তভাবে হাঁড়ির মধ্যে পুরছেন। পুত্রবধূকে দেখে তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়িটার দিকে পেছন ফিরে বসে বললেন—বৌমা? ইয়ে কর তো—আমার ঘরে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে যাও।

—আপনি রাতে কি খাবেন? ভাত রাঁধব?

—না। তুমি শুধু খাবার জল একঘটি দিয়ে যেয়ো এর পরে।

এ সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য পুত্রবধূর রাঁধবার নিয়ম নেই। যার যার, তার তার। ছেলে যখন আসে, বাপের খোঁজ নেয় না। ওরা নিজে রাঁধে, নিজেরা খায়। উপেন ভটচাজ এসে নিজের ঘরের তালা খুলে

বড়জোর একটু জল কোনোদিন বা একটু নুন চান পুত্রবধূর কাছে। এর বেশি তাঁর কিছু চাইবার থাকে না, কেউ তাঁকে দেয়ও না। আজ পুত্রবধূর তাঁর জন্যে রান্না করার প্রস্তাবে তিনি খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারেননি মনে মনে। বোধ হয় সেইজন্যে পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনোভাব হঠাৎ বড় দরাজ হয়ে গেল। তার ফলে যখন আবার সে জলের ঘটি নিয়ে ঢুকল, তখন তিনি হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বললেন—দাঁড়াও বৌমা, করুণাকে দিইছি—আর তুমি এই দুখানা লুচি আর এই একটু মিষ্টি নিয়ে যাও। জল খেয়ো।

পুত্রবধূ দুই হাত পেতে শ্বশুরের দেওয়া আধখানা ক্ষীরের ছাঁচ, খানচারেক লুচি, আধখানা ছানার মালপুয়া ও দুটি তালের বড়া নিয়ে একটু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বশুর হঠাৎ কেন এত সদয় হয়ে উঠলেন তার ওপরে? খেয়ে থাকলেও তো কখনো পোছেন না সে খাচ্ছে, না উপোস করছে?

সে বললে—আমি যাই বাবা?

—হ্যাঁ যাও। পান আছে?

—না তো বাবা। এ হাটে আমার হাতে পয়সা ছিল না। করুণার পাঠশালার মাইনে চার আনা বাকি। তাগাদা করছে মাস্টার। তাও দিতে পারছিনে।

পুত্রবধূর নাম তারা। গরিব ঘরের মেয়ে না হলে আর এমন সংসারে বিয়ে হবে কেন? নিচে নেমে এসে সে ছেলেকে ডেকে দুখানা লুচি আর মিষ্টিগুলো সব খেতে দিলে। নিজের জন্যে রাখলে দুখানা লুচি আর দুটো তালের বড়া। ছেলেকে তালের বড়া খেতে দিলে ওর পেট কামড়াবে রাতে।

সত্যি, তার হাতে পয়সা না থাকায় কোনোদিনই রাতে সে কিছু খায় না। করুণার জন্যে দুবেলার চাল নেওয়া হয় ওবেলা, জল দেওয়া ভাত সন্ধের পিদিম জ্বালিয়েই করুণাকে খেতে দেয়। তার পর মায়ে-পোয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্য নক্ষত্র ওঠে আকাশে, নিত্য চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় ওদের মস্ত বড় ছাদটা। ও ছেলেকে নিয়ে অত বড় বাড়ির মধ্যে একখানা ঘরে শুয়ে থাকে, ইঁদুর খুটখাট করে, কলাবাদুড় পুরনো বাড়ির কোণে কোণে চটাপট শব্দে ওড়ে, ছাদের ধারের বেলগাছটাতে বেলের ডাল বাতাসে দোলে—কোনো কোনোদিন ওর ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, ভয়ে মাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে—ও কি খুটখুট করছে মা?

—কিছু না, তুই ঘুমো। ও ইঁদুর।

—বাইরে ছাদে? ওই শোন—

—ও কিছু না, তুই ঘুমো।

—শাঁকচুন্নী আছে মা বেলগাছে?

—না, সে সব কিছু না।

—শোনো না, রেতার দাদা গল্প করছিল, তাদের বাঁশঝাড়ে শাঁকচুন্নী আছে—রেতা নিজেও দেখেছে একদিন, বুঝলে মা?

—তুই ঘুমো। ওসব বাজে গল্প। আচ্ছা থোকন, আমি একা একা রাত আটটার সময় পুকুরে কাপড় কেচে আসি, আমি কিছু তো দেখিনে?

উপেন ভটচাজের পুত্রবধূর সাহস খুব, একথা গাঁয়েও সকলে বলাবলি করে। অত বড় প্রাচীন অট্টালিকায় বহু ঘরদোরের মধ্যে ছোট্ট একটি ছেলে সম্বল করে বাস করে—ওই ভূতের বাড়িতে। বাবা! শ্বশুর তো কালভেদ্রে বাড়ি ফেরে, সোয়ামীও প্রায় তাই। শনিবারে যদি বা এল, রবিবার বিকেলেই চলে গেল। ধন্যি সাহস বটে মেয়েছেলের!

কেউ কেউ বলে—মেয়েমানুষের ভাই, যাই বল, অতটা সাহস ভালো না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম তা তো কেউ বলতে পারে না!

শেষরাত্রে করুণা আবার মাকে ঠেলা মেরে বললে—ওমা, ওঠো না, কিসের শব্দ হচ্ছে—

—তুই বাবা আর ঘুমুতে দিলি নে। কই কোথায় শব্দ?

কে এসে দরজায় ঘা দিলে। কড়া নাড়লে ওদের ঘরের বাইরে।

তারা ধড়মড় করে উঠে বললে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি। দোর খোল।

করুণা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায়।

ও, বাবা!

তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে একগাল হেসে বললে—এস এস। একেবারে শেষরাত্তিরে? ভালো আছ?

—হ্যাঁ। বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আসতি যা কষ্ট হয়েছে। তালপুকুরের মাঠের মধ্যে বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাত দশটা থেকে। এই খানিকটা আগে তখন চলল।

—তুমি হাত-মুখ ধোও। জল গামলায় আছে, গাড়ুতে আছে। আমি ভাত চড়াই।

—ভাত? শেষরাডিরি ভাত খেয়ে মরি আর কি। আমার পুঁটুলির মধ্যে সরু চিঁড়ে আছে, তাই দুটো ভিজিয়ে দাও। খোকা সরে আয়, তোর জন্যি জিলিপি কিনেছিলাম, তা মিইয়ে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। এই ন্যাও, খোকারে দুখানা দ্যাও, তুমি দুখানা খাও।

—আমি খাব না, তুমি খেয়ে এট্টু জল খাও।

—ওগো না না। যা বলছি শোনো না। আমার পেট ভালো না ক'দিন থেকে। সরু চিঁড়ে ভিজিয়ে নেবুর রস আর নুন মেখে বেশ কচ্‌লে কচ্‌লে কথ বের করে—

—থাক থাক, তোমাকে আর শেখাতে হবে না। হাত-মুখ ধুয়ে এস।

—যাব, তার আগে একবার গাড়ুটা দাও দিকি। গামছাখানা এখানে রেখে দিয়ো—আসছি আমি।

তারা তখুনি চিঁড়ে ভেজাতে দিলে। স্বামী এসে হাত-মুখ ধুয়ে বসল, তার সামনে পাথরের একটা বড় বাটিতে চিঁড়ের কথ নুন লেবু মিশিয়ে তাকে খেতে দিলে।

স্বামী একটুকু মুখে দিয়েই বললে—বাঃ, বেশ! নুন নেবু মিশিয়ে বড় চমৎকার খেতে লাগছে!

—আর দেব?

—না না, এই বেশি হয়েছে। হ্যাঁগা, ধার-দেনা কত এবার?

—মাছ কিনিছিলাম একদিন চার আনা, একদিন দু আনা। আর খোকা আমসত্ত্ব খেতে চেয়েছিল, তাই বোষ্টমবাড়ি থেকে কিনে এনেছিলাম দু আনার।

—আমসত্ত্ব আবার কিনতে গেলে? বড় নবাব হয়েছে, না?

স্বামীর মুখে কড়া সুরের কথা শোনা এই প্রথম নয় তারার। ওর চেয়ে অনেক বেশি রূঢ় ব্যবহার ও কথা সে সহ্য করে আসছে স্বামীর।

গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে তার।

তাও বিনি দোষে। খোকা খেতে চেয়েছিল, ছেলেমানুষ আবদার ধরলে, ও কি বোঝে কিছু? অবোধ—না দিতে পারলে কষ্ট হয়।

—বা রে, খোকা কাঁদতে লাগলো, দেব না কিনে?

—না। বাপের বাড়ি থেকে পয়সা এনে দিয়ো।

—মুখ সামলে কথা কও বলছি। বাপ তুলো না, খবরদার!

-ওরে বাপ্‌রে! দেখো ভয়েতে ইঁদুরের গর্তে না ঢুকি! তবুও যদি বাপের বাড়ির চালে খড় থাকতো!

—ছিল না বলেই তো তোমার মতো অজ পাঁড় মুক্‌খু আর মাতালের হাতে বাপ দিইছিল ধরে!

—তবে রে—

স্বামী ভবতারণ হাতের কাছে ছাতা পেয়ে তাই উঁচিয়ে তেড়ে গেল তারার দিকে। করুণা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। ওপর থেকে উপেন ভটচাজ বলে উঠলেন—কে? কে? কি হল? কে ওখানে?

ভবতারণ উদ্যত ছাতা নামিয়ে বললে—তোমায় আমি—ফের যদি—ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার!

—খবরদার! আবার বাপ তুলছ? বেরোও তুমি বাড়ি থেকে। দূর হও। তোমার মুখে ছাইয়ের নুড়ো দেব বলে দিচ্ছি! বেরোও—

—হারামজাদী দ্যাখ, এখনো মুখ সামলা বলে দিচ্ছি। বেরোব কেন, তোর কোন্ বাবা এ বাড়ি করে রেখে গিইছিল জিগ্যেস করি? তুই বেরো—

করুণা আকুল সুরে কাঁদছে বাবা-মার ধুন্ধুমার ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গিয়ে। ওর মা এসে ওকে কোলে নিয়ে বললে—চল খোকা আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাই—ওরা থাকুক, যাদের বাড়ি। তোর-আমার বাড়ি তো না!

—খবরদার, খোকাকে ছুঁয়ো না বলছি! যাবি হারামজাদি তো একলা মর গে যা—খোকা তোর না আমার?

—বেশ, রাখ খোকাকে। আমি একলাই যাচ্ছি।

—যা—বেরো—

করুণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, তুমি যেয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে যাব—

ভবতারণ বললে—খোকন, কেঁদ না। তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। রেলগাড়ি কিনে দেব, মটোর কিনে দেব—এস—

করুণা কান্নায় জড়িত সুরে বললে—না—

—এস—

—না—

—কলকাতায় যাবিনে?

—না

—মাকে সে আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময়ে ওপর থেকে উপেন ভটচাজ নেমে এসে ছেলেকে বললেন—তুই কী চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ভোররাত্তিরি? তুই মানুষ হলিনে এই দুঃখে আর আমি বাড়ি আসিনে। কেন মিছিমিছি বৌমাকে যা-তা বলছিস?আমি সব শুনছিনে ওপর থেকে! তোরই তো দোষ। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—

—আপনাকে তো কিছু বলিনি—আপনি ওপরে যান বাবা—আমাদের কথার মধ্যে আসতি কে বলেছে আপনাকে?

—আমি যাই না যাই সে আমি বুঝব। আর তুই যে বলছিস বৌমাকে বাড়ি থেকে বেরুতি—আমার বাড়ি না তোর বাড়ি? আমি আজও বেঁচে নেই? তোর কী দাবি আছে এ বাড়ির ওপর? আমি ওপর থেকে সব শুনেছি। বদমাইশ পাজি কোথাকার! আমি মরবার আগে খোকনকে বাড়ি লিখে দিয়ে যাব—কালই যাচ্ছি আমি সদরে। বৌমাকে অছি করে যাব। তোমার বাড়ির আম্বা ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ, হতচ্ছাড়া বদমাইশ। রাতদুপুরের সময় এসে উনি ঘরের বৌকে বলবেন, বেরো, বেরো! মুরোদ নেই এক কড়ার—হ্যাঁরে হারামজাদা, ও ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা মাস কি খায় তুই তার কোনো হদিস রাখিস—না কেউ রাখে? বেরো বলতি লজ্জা করে না? এস তো খোকন, এস—চলো বৌমা—ওপরের ঘরে চলো—

তারা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল শ্বশুর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে ফিসফিস করে খোকনকে কি বললে।

খোকন বললে—ঠাকুরদাদা, তুমি ওপরে যাও—মা—বলছে।

ভবতারণ সাহস পেয়ে বললে—আমি তাড়িয়ে দেবার কথা আগে মুখে এনিছি না আপনার গুণধর বৌমা? জিগ্যেস করুন তো কে আগে কাকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেছে? হ্যাঁ খোকা, বল তো? আপনার বৌমাই বললে না আমাকে বেরিয়ে যেতে? কেন, ওর বাবার বাড়ি?

—হ্যাঁ, ওর বাবার বাড়ি। আলবৎ ওর বাবার বাড়ি। হারামজাদা, ফের যদি তুমি ওসব কথা মুখে এনেছ তবে তোমাকে আমি—

উপেন ভটচাজ ওপরে উঠে চলে গেলেন। ভবতারণ চুপ করে বসে রইল তক্তপোশের এক কোণে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভবতারণ উঠে জামার পকেট হাতড়ে একখানা দু টাকার নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, এই দিলাম—ধার দেনা শোধ দিয়ো। আমি এক্ষুনি চললাম। দেশলাই কে নিল আমার?

তারা বললে—খোকন, দেশলাইটা ঐ রয়েছে, দে তো!

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভবতারণ জামা গায়ে দিতে দিতে বললে, এসেছিলাম অনেক আশা করে। তা এ বাড়ি আমি থাকব না। এখানে আমার পোষাবে না বুঝলাম। কেউ যখন আমাকে দেখতে পারে না এ বাড়িতে খাওয়া হল না, শরীরটাও খারাপ। তা হোক, যাবই। আর আসছি নে। দ্যাখ খোকন, যাবি কলকাতায়? চল আমার সঙ্গে, মটোর কিনে দেব, লবেঞ্চুস কিনে দেব—

করুণা নিরুত্তর।

—যাবি?

—না।

—এস আমার সোনা, আমার মানিক, চল আমার সঙ্গে—

এই সময় তারা এগিয়ে এসে স্বামীর হাতে ধরে বললে, কেন পাগলামি করছ? বস, এখনো অন্ধকার রয়েছে—এখন কোথায় যাবে? ছিঃ—

—ছাড়ো হাত—

ঝটকা মেরে ভবতারণ হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার মতো ইতরের সঙ্গে আমি কথা বলিনি। আমি খোকনের সঙ্গে কথা বলছি।

—রাগ করে না—ছিঃ—

—ফের আবার? এইবার কিন্তু ভালো হবে না বলছি। খবরদার, আমার গা ছুঁয়ো না!

—আচ্ছা ছোঁব না। বসো ওখানে।

—ফের কথা বলে! খোকন, ও খোকন—যাবি আমার সঙ্গে? আয়—আর কখনো যদি এ ভিটেতে পদার্পণ করি তবে আমার—

করুণা মায়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না—

সকালবেলা। বেশ রোদ উঠেছে।

তারা স্বামীকে দুখানা পেঁপের টুকরো হাতে দিয়ে বললে, খাও। পেট ঠাণ্ডা হবে।

ভবতারণ এই ঘুমিয়ে উঠেছে। চোখ ভারী-ভারী। পেঁপের রেকাবি হাতে নিয়ে বললে, উনি কোথায়?

—ওপরে।

—যাবেন না?

—তা কি জানি।

—খাবেন?

—উনি কবে খান? কাল সন্দের সময় এলেন, বললাম। ভাত রেঁধে দিই। উনি বললেন, না।

—পেঁপে আর আছে? দিয়ে এসো না ওপরে।

—সে তুমি বললে তবে দেব? সে দিয়ে এসেছি, তুমি তখন ঘুমিয়ে।

—দিয়ো। বুড়ো মানুষ।

—সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

—খোকন—ও খোকন—শোন—

—ও খেয়েছে, ওকে ডাকছ কেন? তুমি খেয়ে ফেল। তোমার পেট ঠাণ্ডা হবে পেঁপে খেলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

—এখনো গোলযোগ যায়নি। ভাতে জল দিয়ে নুন নেবু দিয়ে তাই খাব। তেল দ্যাও, নেয়ে আসি।

করুণা বাপের কাছে এসে বললে, কি বাবা?

—এই নে, খা—

তারা বললে, আহা, কেন আবার—তুমি খাও—

এই সময় উপেন ভটচাজ খড়ম পায়ে দিয়ে উপর থেকে নেমে এলেন। ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন—কে? ভবতারণ? ভালো পেঁপে, খা। ইয়ে বৌমা, আমি আসি—ওখানেই খাব। ভবতারণ আজ আছিস তো?

ভবতারণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, না বাবা, ওবেলা চলে যাব। আপনি আসবেন না ওবেলা?

—আচ্ছা, তুই যাবার আগে আমি ফিরে আসবো। আমি—

এই সময় তারা ফিশফিশ স্বরে কি বললে স্বামীকে। ভবতারণ ডেকে বললে, বাবা—

—কি?

—এবেলা এখানে দুটো খাবেন, আপনার বৌমা বলছে। কই মাছ আনতে যাচ্ছি বাঁধালে। একসঙ্গে বসে অনেকদিন খাইনি—কেমন?

উপেন ভটচাজ সম্মতি জ্ঞাপন করে রোয়াক থেকে উঠানে পা দিলেন। কি ভেবে এসে আবার বসলেন রোয়াকে।

পুত্রবধূ বললে—তামাক সেজে দেব?

—দ্যাও দিকি।

ছেলে ভবতারণ নিজেই তামাক সেজে নিয়ে এল। বৃদ্ধ উপেন ভটচাজ চোখ বুজে হুঁকোয় টান দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সকালবেলা কতকাল আসেনি তাঁর জীবনে। স্ত্রী মারা গিয়েছে আজ বোধ হয় বিশ বছর, ভবতারণ তখন এগারো বছরের বালক। তার পর থেকেই ছন্নছাড়া সংসারজীবন চলছে, আঁটসাঁট নেই কোনো বিষয়ে কারো। তার ওপরে দারিদ্র্য তো আছেই। হাতে পয়সা ছিল না বলেই ভবতারণকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। লেখাপড়া শেখালে অত খারাপ হত না সে। অবহেলিত পুত্রের প্রতি উপেন ভটচাজের মায়া হল। কাল অত বকুনি দেওয়াটা উচিত হয়নি।

ভবতারণ বাড়ি ফিরে এল আটটার সময়। স্ত্রীকে বললে—দেখ, কারে বলে যশুরে কই! আধ পোয়ার নামো নেই, ওপরে এক পোয়া, পাঁচ ছটাক। বাবাকে দেখাও।

পুত্রবধূ বললে—এই দেখুন—

—বাঃ বাঃ—কত করে সের নিলে?

—সাড়ে তিন টাকা।

—তা হবে। যুদ্ধের সময় ছিল ভালো। এ দিন দিন যা হয়ে উঠল—

অনেক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটল উপেন ভটচাজের ভাগ্যে। এমন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কতকাল হয়নি। তিনি পড়ে থাকেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে পেটের দায়েই তো। ছেলে উপযুক্ত হয়নি, নিজেরই ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পারে না। ওদের ভার লাঘব করবার জন্যেই তিনি পরের বাড়ি খান।

খাওয়া-দাওয়ার পর উপেন ভটচাজ দিবানিদ্রা দেবার জন্যে ওপরের ঘরে চলে গেলেন। পুত্রবধূ তামাক সেজে দিয়ে গেল। আঃ, কি আরাম! সব আছে তাঁর, অথচ নেই কিছুই।

আজ দিনটা একটা চমৎকার দিন, এমন দিন আবার কবে আসবে?

বারমেসে সজনেগাছে ফুল ফুটেছে। ডালপাতা নড়ছে বর্ষার সজল বাতাসে! ঘুমিয়ে পড়লেন উপেন ভটচাজ। উপেন ভটচাজের পুত্রবধূও আপন মনে আজ খুব খুশি। ছন্নছাড়া ভাঙা বৃহৎ বাড়ি আজ যেন কার পাদস্পর্শে লক্ষ্মীর সংসারে পরিণত হয়েছে। দোতলায় শ্বশুরকে তামাক সেজে দিতে যাওয়ার সময় এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। তার আছে সবাই। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র—যা চায় মেয়েরা, এত বড় বাড়ি, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। ওদের সকলের পাতে পাতে ভাত-মাছ দিয়ে আজ কত সুখ পেয়েছে সে। ওদের খাইয়ে সুখ। ভাবতে ভাবতে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ভবতারণ অন্য দিন খেয়েদেয়ে আড্ডা দিতে বেরোয় রায়-পাড়ার হরু রায়ের নাতি অমূল্য রায়ের ওখানে। স্থলপথের যাত্রী দুজনেই। দুপুরের পর ভরা পেটে মৌতাত জমে ভালো।

আজ কিন্তু সে বাইরে গেল না। স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হল। কেন, দুটো গল্প করতে কি হয়েছিল?তারাকে কি সে রোজ রোজ পায়? কত কষ্টে থাকে এই বাড়িতে একা—সে নিজে অক্ষম স্বামী, কিছু করবার পথ তার নেই সামনে।

সে ভালো হবে ভাবে, ভেবেছে কতবার। কিন্তু তা হবার জো নেই। সে জানে কেন? সঙ্গ বড় খারাপ জিনিস। সে-সব বন্ধুদের সঙ্গ তাকে এইখানে নামিয়েছে। জলপথ ও স্থলপথ, কোনো পথ বাকি রাখেনি। আজকের সংকল্প কাল উড়ে যাবে কর্পূরের মতো।

তবুও আজকের দিনটি একটা সুন্দর, জাঁকালো, শান্ত দিন হয়ে থাক তার জীবনে। তারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললে,—চা আছে ঘরে? চা করো—বাবাকে দিয়ে এস, আমিও একটু খাই—

—না, চা খায় না। নেবু আর নুন দিয়ে চিঁড়ের কথ করে দি—

স্ত্রী সত্যি তাকে যত্ন করবার চেষ্টা করে। তাঁর অদৃষ্টে নেই, কার কি দোষ? তারা সত্যি ভালো মেয়ে বড্ড।

এদিকে দিবানিদ্রা ভেঙে উপেন ভটচাজ সবে উঠেছেন, অমনি পুত্রবধূ গরম চায়ের গ্লাস নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলে। বিস্মিত চোখে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—কি? চা? বাড়িতে ছিল?

—ছিল।

—বেশ, বেশ।

পুত্রবধূ হাসিমুখে বললে—আর কিছু খাবেন?

—হ্যাঁ, তা—কি খাওয়াবে?

—বেশ দোভাজা করে চিঁড়ে ভেজে নারকোল-কোরা দিয়ে নিয়ে এসে দেব?

—বেশ। কাঁচা লঙ্কা অমনি ঐ সঙ্গে একটা এনো। আর শোনো, ভবতারণকে আর খোকনকেও দিয়ো।

—তামাক দেব বাবা?

—এখন না। চিঁড়েভাজা আগে খাই, তার পরে। বাঃ, মৌতাতটা নষ্ট করে দেবে বৌমা?

এমনি সুন্দর হাসিখুশির মধ্যে সেদিনের সূর্য ডুবে গেল জামদার বড় বিলের ওপারে।

সারাদিন কেউ কোথাও নেই।

ভবতারণ চলে গিয়েছে। যা সামান্য দুটি টাকা দিয়ে গিয়েছে তাতে পাঁচদিনের চালও হবে না। উপেন ভটচাজ গিয়ে উঠেছেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে।

একা রয়েছে তাঁর পুত্রবধূ সেই প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়িতে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে রাত্রে। আবার কলাবাদুড় ওড়ে কড়িকাঠের খোপে খোপে, পেঁচা ডাকে ডুমুরগাছের নির্জন অন্ধকারের মধ্যে, করুণা ঘুমের মধ্যে মাকে বলে—ও কিসের শব্দ মা? ওঠো ওঠো—ওটা কি মা?